বাংলার পদবি কথা

দেবাশিস ভৌমিক

পুনশ্চ

॥ ভূমিকা ॥

পৃথিবীতে যত কিছু অভিধান আছে তা মোটেই যথেষ্ট নয় মানুষের ব্যবহৃত শব্দসমূহের জন্য। মানুষকে চিহ্নিতকরণ বা শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নামের প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে। নাম দিয়েই তার চেহারাটি পরিচিত হয় জনসমক্ষে। কিন্তু নামের পরে পদবি নামক লেজুড়টি জুড়ে দেবার সত্যিই কোনো তাৎপর্য ছিল কি? নামের সঙ্গে পদবি না জুড়লে পরিচয় পর্বে খাম্‌তি ঘটে, এ কথা অস্বীকার করবার জায়গা নেই। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, পরিচিত বর্গ ছেড়ে নিজের কৃতি দিয়ে মানুষ যখন সাধারণের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন পদবির ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ে। সাহিত্য, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞান থেকে রাজনীতি, খেলা, বিনোদন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাওয়া মানুষের পরিচয় দেবার জন্য অর্থহীন হয়ে যায় পদবি। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে যে, সাধারণের মধ্যে একই ধর্ম বিশিষ্ট জীব বা প্রাণীকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করবার জন্য প্রথমে নামকরণের আবশ্যক। তারপর সেই নামকরণ-বিশিষ্ট মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলে পদবি জুড়ে তাকে চিহ্নিতকরণ করা হয়। সাধারণভাবে এই হল পদবি উদ্ভবের গোড়ার কথা।

বহু প্রাচীনকালে পদবি ব্যবহারের কোনো চল ছিল না। পদবি বিষয়টি তখনও কারও মাথায় আসেনি। পদবি ব্যবহারের প্রকৃত কোনো তাৎপর্যও হয়তো ছিল না। পুরোনো পুথিপত্র ঘাঁটলে দেখা যাবে, মনুসংহিতা ও বৃহৎধর্মপুরাণে পদবি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। গুণ এবং কর্ম অনুসারে আর্যভাষী মানুষদের পদবি দেবার কথা বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে চতুর্বর্ণের উল্লেখ এবং সেই অনুসারে পদবি দেবার প্রসঙ্গ এসেছে। যাঁরা ব্রাহ্মণ বলে চতুর্বর্ণে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁরা নিজেদের নামের পরে শর্মা বা দেবশর্মা পদবি ব্যবহার করবেন। যাঁরা ক্ষত্রিয় তাঁরা ব্যবহার করবেন বর্মা বা রায়বর্মা পদবি। বৈশ্যের জন্য বরাদ্দ পদবি ভূতি এবং শূদ্রজাতির জন্য বরাদ্দ হয়েছে দাস পদবি। বৈদিক বা পৌরাণিক যুগে যে সব হিন্দু রাজারাজড়াদের কথা জানা যায় তাঁরা নামের পরে পদবি ব্যবহার করতেন বলে মনে হয় না। তবে সাধারণের মধ্যে এই সময় থেকে পদবি দেবার প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হয়।

সময় যত সামনের দিকে এগিয়েছে ততই পদবি দেবার বা পদবি গ্রহণ করবার নানা ধারা তৈরি হতে শুরু করেছে। বংশপরিচিতির ধারক হিসেবে পদবিটাই এই

সময় থেকে বিস্তার লাভ করে সব চাইতে বেশি। যে সব পারিবারের নির্দিষ্ট পরিবারিক নাম রয়েছে তাঁরা সেই পারিবারিক নামটিকে পদবি হিসেবে ব্যবহার করছেন, এমনটাও দেখা গেছে। দক্ষিণ ভারতের দিকটাতে অঞ্চলের নাম কিংবা পারিবারিক নাম, দুটোই একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় নামের পরে। সেক্ষেত্রে প্রথমেই থাকে পারিবারিক নাম বা পদবি। এই পারিবারিক নাম বা পদবি তাঁর অঞ্চলের নামও হতে পারে। তারপর থাকে ব্যক্তির বাবার নাম। অবশেষে তাঁর ব্যক্তিগত নাম। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের বিচিত্র পরিচিতি প্রচলিত নেই। উত্তর ভারতের দিক থেকে শুরু করে পশ্চিম বাংলা পর্যন্ত পদবি উদ্ভবের পেছনে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে হিন্দু জাতির প্রতি শাস্ত্রের কড়া নির্দেশ। সেই নির্দেশ অনুসারেই তৈরি হয়েছে তার সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি। এটা একেবারে গোড়ার দিককার কথা।

শোনা যায়, গোড়ার দিকে গুণ বা কর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ হয়ে থাকলেও ক্রমশ প্রতিটি জাতির মধ্যে নিষ্কর্মা সন্তানের সংখ্যা বাড়তে শুরু করল। ব্রাহ্মণ সন্তান অথচ লেখাপড়া বা অন্যান্য ক্ষেত্রে অষ্টরম্ভা, তিনিও পিতৃকুলের পরিচিতি অনুসারে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে সংকোচবোধ করলেন না। সত্ত্বগুণ না থাকা সত্ত্বেও তিনি এবং তাঁর সন্তানাদি ব্রাহ্মণই রয়ে গেলেন। রাজা হবার যোগ্যতা নেই, শক্তি নেই, বুদ্ধি নেই অথচ সেই পরিবারের সন্তানও ক্ষত্রিয়বংশ নিয়ে গর্বে বুক ফুলিয়ে চলতে শুরু করলেন। রজোগুণ না থাকা সত্ত্বেও এই ধরণের বারফাট্টাই সমাজে ক্রমশ বেড়ে চলল। অর্থাৎ গুণ বা কর্ম অনুসারে জাতি বা পদবি তৈরির যে নির্দেশ শাস্ত্রকারেরা দিয়েছিলেন, ক্রমশ তা ভিন্নমুখী হয়ে গেল। অর্থাৎ তার আর কোনো তাৎপর্য রইল না। ফলে পদবি উদ্ভবের ধারা একটু নতুন পথে যাত্রা শুরু করল।

প্রকৃত অর্থে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কাল থেকে ভারতবর্ষে পদবি বিষয়টি একটু বাড়তি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। সময়ের ইতিহাসে এটা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কথা। এই সময় থেকেই সমাজে ক্রমশ বাড়তে থাকল অসবর্ণ বিবাহ। জাতপাতের কোনো ভেদাভেদ সেভাবে মাথাচাড়া দেবার মতো অবস্থায় ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র একই পঙ্‌ক্তিতে বসে খাওয়া দাওয়া করত। এই সময় ব্যক্তি নামের অর্ধেকটা নাম হিসেবে এবং বাকি অর্ধেকটা পদবি হিসেবে ব্যবহৃত হবার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ফের জেগে ওঠায় পদবি নির্মিতির এই বিশেষ প্রথা সমাজে আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়ল। একে একে এলেন পাল এবং সেন রাজারা বঙ্গদেশের অধীশ্বর হয়ে। বল্লাল সেন তো রাজা হয়েই নাকি ৩৬টি জাত বা শ্রেণির জন্ম দিলেন। সমাজে উঁচু জাত, নীচু জাতের

ধারণাটা এই সময় থেকে প্রখর হতে লাগল। 'বল্লালি বালাই'-টিকে রইল ব্রিটিশের ভারত আগমনের সময় পর্যন্ত। এখান থেকেই স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, উঁচুজাত, নীচুজাত ইত্যাদি কুসংস্কারগুলি স্ফীত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বঙ্গদেশের শরীর জুড়ে।

ধীরে ধীরে ভারত স্বাধীন হয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশের কাঠামো নির্মাণে এগিয়ে এসেছেন সবজাতির মানুষ। উঁচু নীচুর ভেদ ভুলে প্রগতির কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সকলেই। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই প্রথম গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল জাতপাতের বিরুদ্ধে। একটু একটু করে পারিবারিক পরিচিতির পাশাপাশি আবার জায়গা পেতে শুরু করেছে গুণ বা পেশাগত পরিচয়। স্বাধীনতার পর পিছিয়ে পড়া ব্রাত্য মানুষদের তুলে আনা হয়েছে তপশিলি জাতি ও উপজাতি তালিকায়। সংরক্ষণের আওতায় আনার এই শুভপ্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছেন সবমানুষই। ফলে সমাজের দুষ্টক্ষত হিসেবে জাতপাতের যে মহীরুহটি আকাশ ছুঁয়েছিল বল্লাল সেনের আমল থেকে, তা ক্রমশ ক্ষীণবল হয়ে আজ প্রায় অলীক। কিন্তু ইতিহাসকে বাদ দিয়ে তো সমাজকে ভাবা হয় না। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে সময়কে যাচাই করে নেবার অবকাশ কখনো ফুরিয়ে যায় না। তাই বারবার পিছনে ফিরে দেখতে হয় অতীতের আলো আঁধারির খেলা। জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, জাতশ্লাঘা ইত্যাদি বিষয়গুলি কীভাবে একটু একটু করে ফিকে হয়ে আসছে, তার একটা জলছবি নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। পাশাপাশি বাঙালি পদবির উদ্ভব ও তার অর্থগত তাৎপর্য কতটা সময়ের দাঁড়িপাল্লায় চাপানো গেছে তারও একটা চলচ্ছবি দেবার চেষ্টা হয়েছে।

অনেকেই হয়তো জানেন না, তাঁদের পারিবারিক পদবিটি ঠিক কোথা থেকে এসেছে। এ পদবির অর্থই বা কী। তাঁদের জিজ্ঞাসা নিরসনের একটা চেষ্টা এখানে আছে। বাঙালি পরিবারে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে জাতিসমন্বয়, পদবি ইত্যাদি বিষয়গুলি আজও প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আলোচনায় উঠে আসে গোত্র, প্রবর ইত্যাদি প্রসঙ্গও। সেসব নিয়েও সাধ্যমতো আলোচনা রয়েছে এখানে। পদবি বলে যাঁরা নিজেদের গর্বিত প্রতিপন্ন করতে চান, তাঁদের হয়তো জানাই নেই যে সেই পদবিটি ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা নেহাৎ কম নেই। কাজেই একটি মাত্র জাতির জন্য একটিই পদবি এবং সেই মহান পদবির অধিকারী কেবল তিনিই, এই মিথ্যার ভড়ং থেকে তাঁকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে আলোচ্য গ্রন্থটি। তথাকথিত উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণের মানুষ যে বহুদিন আগে থেকেই একই পদবি ব্যবহার করে আসছেন, এটাও অনেক বঙ্গবাসীর কাছে অজানা বিষয়। সেখানকার কুয়াশা কেটে সূর্য দেখার স্বপ্ন পাওয়া যাবে এ গ্রন্থে।

'বাংলার পদবি কথা' নির্মাণে অনেকগুলো বছর কোথা দিয়ে যে চলে গেল জানি না। কিন্তু প্রস্তুতির এই দীর্ঘ যাত্রাপথে যাঁদের প্রত্যক্ষ সাহায্য আমার শ্রমকে অনেকটাই লাঘব করেছে তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। এই তালিকায় প্রথমেই যাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই তিনি আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী চৈতালী ভৌমিক এবং কন্যাদ্বয়—মিত্রবিন্দা ও ঐশীপ্রমা। আমি যে কলেজে অধ্যাপনা করি সেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ড. পীযূষকুমার দাস এবং সকল অধ্যাপক বন্ধুদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। আমি কৃতজ্ঞ 'পুনশ্চ' প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়ক ও শ্রীসন্দীপ নায়কের কাছে। কারণ তাঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া এ গ্রন্থ আলোর মুখ দেখার সুযোগ পেত না। যাই হোক, বিশেষ কোনো জাতির প্রতি অবজ্ঞা বা অসম্মান প্রদর্শন করা এ গ্রন্থের লক্ষ্য নয়। তবুও উল্লিখিত কোনো বিষয় নিয়ে কেউ দুঃখ পেলে আমি ক্ষমা চেয়ে রাখছি। বইটির ভালোমন্দ বিচারের ভার উৎসাহী পাঠকের কাছে ছেড়ে দিয়ে কৃতার্থ হতে চাই।

বিনীত—

দেবাশিস ভৌমিক
বিভাগীয় প্রধান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কালিয়াগঞ্জ কলেজ

তনিকা
কৃষ্ণনগর, নদিয়া

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় / পদবি উদ্ভবের গোড়ার কথা	১৩-৫২
ক. বেদের যুগ	১৫
খ. ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগ	১৮
গ. বঙ্গদেশে জাতিতত্ত্বের ক্রমবিকাশ	২২
ঘ. জাতি বিভাজনের ইতিহাস	২৭
ঙ. বাংলা সাহিত্যে জাতি বিভাজনের তথ্য	২৯
চ. বৃত্তি অনুসারে জাতি বিভাজন	৩৯
দ্বিতীয় অধ্যায় / বাঙালিদের পদবিসম্ভার	৫৩-৮০
তৃতীয় অধ্যায় / কোন্ জাতির কী পদবি	৮১-১১০
চতুর্থ অধ্যায় / সংরক্ষিত হিন্দুজাতির জন্য বরাদ্দ পদবি	১১১-১৩৬
ক. বঙ্গদেশে তপশিলি জাতির সংখ্যা	১১৩
খ. বঙ্গদেশে তপশিলি উপজাতির সংখ্যা	১১৫
গ. জাতি : তপশিলি ❑ পদবি	১১৭
ঘ. উপজাতি : তপশিলি ❑ পদবি	১২৮
ঙ. জাতি : অনগ্রসর ❑ পদবি	১৩১
চ. অগ্রসর ও অনগ্রসর : উভয়তালিকার পদবি	১৩৩

পঞ্চম অধ্যায় / বঙ্গদেশে পদবির বিচিত্র উদ্ভব কথা ১৩৭-১৬০
ক. গোত্র অনুসারে পদবি ১৩৯
খ. কর্ম বা পেশা অনুসারে পদবি ১৪৩
গ. প্রাপ্ত উপাধি ভিত্তিক পদবি ১৪৫
ঘ. স্থান অনুসারে পদবি : পদবি নাম অনুসারে স্থান নাম ১৪৭
ঙ. ব্রাহ্মণ জাতির পদবি ১৫০
চ. কায়স্থ জাতির পদবি ১৫৬
ষষ্ঠ অধ্যায় / বাংলা প্রবাদ প্রবচনে পদবি ও জাতপাত ১৬১-২১৮
সপ্তম অধ্যায় / একাধিক জাতি : অভিন্ন পদবি ২১৯-২৫৬
অষ্টম অধ্যায় / হিন্দু বাঙালি পদবি ও জাতি-সংগঠন ২৫৭-৫০৪
ক. হিন্দু বাঙালি পদবির শব্দার্থ ও উৎসগত তাৎপর্য ২৫৯
খ. পশ্চিমবঙ্গের জাতিভিত্তিক সংগঠন ৫০২
নবম অধ্যায় / শেষ কথা ৫০৫-৫১৬
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৫১৭-৫১৮
পদবি উৎস : নির্ঘন্ট সূচি ৫১৯-৫২৮

প্রথম অধ্যায়

॥ পদবি উদ্ভবের গোড়ার কথা ॥

ক) বেদের যুগ :

পদবি শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল বংশসূচক নাম। একে উপাধি বা উপনাম বলেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য নিয়ে পদবি শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়—সং √পদ্ + অবি (ণে), + ঈ। পদবি বলতে খেতাবকেও বোঝানো হত আগে। কিন্তু ধীরে ধীরে খেতাব শব্দটি যোগরূঢ় শব্দে পরিণত হয়ে গেছে। উপাধি শব্দটির ব্যবহার অবিভক্ত বঙ্গদেশে যথেষ্ট চালু ছিল। কিন্তু আজ আর উপাধি ব্যবহারের প্রবণতা তেমন করে চোখে পড়ে না। বরং পদবি কিংবা উপাধির পরিবর্তে title ব্যবহার করে বাঙালি তার বাংলাভাষাকে গৌরবান্বিত করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পদবি শব্দটির দরকার পড়ল কেন। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় নাম ব্যবহার করেই তো প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল। তাহলে নামের পর আবার পদবি ব্যবহার অপরিহার্য বিবেচিত হল, কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া বড়ো সহজ কাজ নয়। এই বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের এক ধারাবাহিক ইতিহাস, আর তার সূত্রপাত ঘটেছিল কয়েক হাজার বছর আগে। নানা ধরণের প্রাচীন সাহিত্য পুরাণ ইত্যাদি তথ্য প্রমাণ থেকে পদবির উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে, ইতিহাসের সমান্তরাল।

বিভিন্ন ধরণের ঐতিহাসিক প্রমাণকে সামনে রেখে গবেষকেরা বলতে চেয়েছেন, ভারতীয় সমাজ বলতে প্রাচীনকাল থেকেই আমরা যাকে জানি তা তৈরি হয়েছিল বিমিশ্র উপাদানের সমবায়ে। তাঁরা আরও বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে প্রধানত চার শ্রেণির লোকের বাস ছিল।[১] প্রথম শ্রেণিটির নাম দেওয়া হয়েছে আর্য। কেউ কেউ একে ভারতীয় আর্য নামে চিহ্নিত করতে বেশি পছন্দ করেন। এই ভারতীয় আর্যরা উচ্চশ্রেণির হিন্দু। অর্থাৎ সিন্ধুনদের তীরবর্তী মানুষ। এরা দীর্ঘদেহী অর্থাৎ খুব লম্বা-চওড়া এদের চেহারা। এরা গৌরবর্ণ অর্থাৎ খুব ফরসা গাত্রবর্ণের অধিকারী, এদের চোখ বড়ো বড়ো ও টানা টানা। দীর্ঘ নাসার অধিকারী ছিলেন এরা। যে ভাষায় এইসব মানুষেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করতেন তা সংস্কৃতমূলক। সংস্কৃতমূলক বলতে কিন্তু আজকের সংস্কৃত ভাষাকে বোঝানো হচ্ছে না। এখানে সংস্কৃত বলতে cultural language বোঝানো হচ্ছে। এটি হল একটি শ্রেণি। দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছে দ্রাবিড়। এদের বেশিরভাগ ছিলেন

দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। এদের শারীরিক গঠন আর্যদের তুলনায় অনেকটাই আলাদা। এদের ভাষা ছিল তামিল, তেলুগু, মালয়ালম্ ও কন্নড়। এই ভাষাগুলির মধ্যে একটিও সংস্কৃতমূলক ভাষা বা cultural language ছিল না। তবে সংস্কৃতমূলক ভাষা থেকে কিছু কিছু শব্দ বহণ নিয়ে এরা নিজেদের কাজে লাগাত। ভারতবর্ষে তৃতীয় যে শ্রেণিটি ছিল তারা মূলত ছিল আদিম উপজাতি গোষ্ঠির মানুষ। যাদের পরবর্তীকালে কোল, ভিল, মুণ্ডা ইত্যাদি শ্রেণি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের বসবাস ছিল মূলত পাহাড়ে বা জঙ্গলে। এদের শরীরের গঠন খর্বাকৃতি। গায়ের রং কালো। এদের নাক থ্যাব্‌ড়া। ভাষাও সম্পূর্ণ আলাদা। কোনো শ্রেণির ভাষার সঙ্গে এদের ভাষা মেলে না। আর শেষ বা চতুর্থ শ্রেণিটির মধ্যে পড়ছে মঙ্গোলীয় লক্ষণযুক্ত মানুষেরা। এদের গায়ের রং হল্‌দেটে ধরণের, যাকে পীতবর্ণ বলে। এদের দাড়ি গোঁফ তেমন একটা গজায় না। নাক থ্যাব্‌ড়া। মুখটা চ্যাপ্‌টা ধরণের। এদের চোয়ালের হাড় বেশ উঁচু। এরা বেশিরভাগই হিমালয় ও আসামের পার্বত্য এলাকার অধিবাসী ছিলেন। সিন্ধু সভ্যতার সমকালে এই চার ধরণের শ্রেণি খুঁজে পাওয়া যায় ভারতীয় সমাজব্যবস্থার শরীরে। ইতিহাসের সত্য আর সমাজ বিজ্ঞানের যৌথ পথচলা সম্ভবত শুরু হয়েছিল এভাবেই।

সিন্ধুসভ্যতার ঠিক পরবর্তী যুগটিই হল বৈদিক সভ্যতার যুগ। অর্থাৎ এই সময় থেকেই চতুর্বেদ কথন ও শ্রবণের ধারা শুরু হয়। ঋক্‌বেদের শেষ দিকটাতে চারটি বর্ণের নাম পাওয়া গেছে। উচ্চবর্ণ এবং শূদ্রদের মধ্যে একটা সামাজিক বিভেদ বরাবরই বজায় ছিল, তারও সূত্র মেলে এই ঋক্‌বেদের মধ্যে। সামাজিক বিভেদের এই বর্ণনা আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে অথর্ববেদে। এখানে দেখা যাচ্ছে, সে যুগে ব্রাত্য[২] নামে একটি সম্প্রদায় ছিল। তারা বৈদিক ধর্ম আচার কিছুই মানত না। তবে এদের সংঘবদ্ধ শক্তি ছিল জোরালো, তাই অথর্ববেদে এদের দেবায়িত করা হয়েছে। পুরাণের যুগে আবার দেখা যায়, বেদ বিরোধী তিনটি মতবাদের জন্ম হচ্ছে—বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক মতবাদ। এই সময়ে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাইরে থাকা কিছু কিছু শ্রেণির কথা জানা গেছে। যেমন—কিরাত, হুণ, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, সুহ্ম, যবন, যশ ইত্যাদি। ভাগবত পুরাণে এই তথ্যটি পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ওপর প্রথম আঘাত এসেছিল এই পুরাণের যুগেই। নন্দ, মৌর্য, অন্ধ্র ইত্যাদি রাজবংশের প্রাধান্য এই সময় সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ওপর যথেষ্ট আঘাত হেনেছিল বলে জানা যায়। শূদ্র রাজারা নিজেরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন যা কিনা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে পড়ত। এইসব শূদ্র রাজারা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে সম্রাট অশোকের

শেষ জীবনের কৃতির মধ্যে। কলিঙ্গযুদ্ধের পর বৌদ্ধ ধর্ম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার জন্য অশোক কী না করেছেন!

এরপর এল রামায়ণ-মহাভারতের যুগ। রামায়ণে আর্যসভ্যতার বাইরে আরও দুটি জীবনধারার উল্লেখ করলেন বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাস সকলেই। দুটি ধারাই দাক্ষিণাত্যকেন্দ্রিক। একটি আর্যদের অনুকূল বানর সভ্যতা আর অন্যটি দক্ষিণে লঙ্কা নামক দ্বীপের আর্যবিরোধী রাক্ষস সভ্যতা। তবে এই রামায়ণেই নিষাদ, শরব, গৃধ্র ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া গেছে। রামায়ণে যক্ষ এবং নাগ নামে দু'টি শ্রেণির কথা জানা যায়। যক্ষরা নাকি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। এরা প্রথমদিকে রাক্ষসদের সঙ্গে থাকলেও পরে এদের লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরা চলে আসেন উত্তর ভারতে। রামায়ণে আরেকটি শ্রেণির কথা জানা যায়। তাদের নাম ছিল নাগ। এই নাগ গোষ্ঠীর মানুষ তাদের শ্রেণিপ্রতীক হিসেবে সাপ ব্যবহার করত। একবার লঙ্কা ও মালাবারকে অন্তর্ভুক্ত করে এরা স্বতন্ত্র একটি রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই নাগ গোষ্ঠির মেয়েরা খুব সুন্দরী ছিলেন। রামায়ণে আছে, রাবণ নাকি একাধিক নাগরমণীকে হরণ করেছিলেন। রাক্ষস ছাড়াও অসুর নামে আরেকটি শ্রেণি বা জাতির কথাও জানা যায় রামায়ণ থেকে। এরা ছিল রাক্ষস বিরোধী। এখানে বলে রাখা ভালো যে, প্রচলিত ধারণায় অসুর বা রাক্ষস বলতে আমরা যে ধারণা করি তার কোনো ভিত্তিই নেই সমাজগঠন বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে। এখানে অসুর বা রাক্ষস সেকালে সত্যিই স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল ভারতীয় সমাজব্যবস্থায়। যাই হোক, এরপর ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শ্রেণিবিভাজন রীতি একটু অন্যপথ ধরে এগিয়েছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। আগে দেখা যাক, বৈদিক যুগে যে শ্রেণিবিন্যাসের কথা বলা হল তার স্বরূপটি আদৌ ঠিক কী রকম।

ঋক্‌বেদের পুরুষসূক্তেই প্রথম চারটি বর্ণের নাম পাওয়া গিয়েছিল।[৩] নামগুলি সম্পর্কে সকলেই অবহিত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ঋক্‌বেদে আছে এক মহাকায় পুরুষের শরীর থেকে এই চারবর্ণের উদ্ভব। বিরাটাকৃতি সেই পুরুষের মুখ হল ব্রাহ্মণ, তার বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উদর থেকে বৈশ্য এবং উরু ও পা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল শূদ্র। অবশ্য শূদ্র জাতির উদ্ভব নিয়ে নানা মতান্তর রয়েছে। কেউ বলেন, আর্যসভ্যতা যখন ভারতবর্ষে বিস্তারলাভ করছে সেই সময়ে আদিম অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের মেলামেশা হতে থাকে। আর্য ও অনার্যের মধ্যে যৌন সম্পর্কজাত যে সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করেন, তারাই পরবর্তীতে শূদ্র নামে পরিচিত হন। আবার কেউ কেউ বলেন, গোড়াতেই ভারতবর্ষে যে অনার্য জাতিটি বর্তমান ছিল তাদেরকেই পরবর্তীতে শূদ্র বলা হয়েছে। তবে এদের স্বতন্ত্র জাতি না বলে উপজাতি হিসেবেই

দেখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্ণবিভাজনের ব্যাপারটি ঠিক কবে থেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেল। শাস্ত্র-পুরাণ ঘাঁটলে দেখা যাবে, গীতাতেই[৪] প্রথম বলা হয়েছিল যে, গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণভেদ সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত। বেদের যুগ ও তার পরবর্তী যুগে বর্ণবিভাজনের ভিত্তি ছিল জন্মগত। কিন্তু গীতার সময় থেকে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বর্ণ বিভাজনের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেতে শুরু করছে। আসছি সে কথায়। তার আগে সেই সময়ের সামাজিক বিধিবিধানগুলির দিকে একবার সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া যাক।

খ) ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগ :

বৈদিক যুগে অনার্য বলতে বোঝাত 'পণি'[৫] নামে পরিচিত লোকদের। এরা গবাদি ও ধনদৌলত চুরি করে আর্যদের নানাভাবে উৎপীড়ন করত। ঋক্‌বেদে সে কথা আছে। এখানেই 'দাস' নামে একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। এই 'দাস' রা ছিল এক শ্রেণির শক্তিশালী অনার্য সম্প্রদায়ের লোক। এরাও আর্যদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করত। আবার এও দেখা যাচ্ছে যে, এই 'দাস'-দেরই আর্যরা চাকর হিসেবে বাড়িতে কাজে লাগাত। অবশ্য অথর্ব বেদের যুগে 'দাস'-দের কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। এই যুগে দাসদের ক্রীতদাস, ভাড়া করা মজুর নাকি বেতনভোগী কর্মচারীর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হত, তা স্পষ্ট করে বোঝা যায় না।

এর পরের যুগ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যুগে শূদ্রজাতিকেই দাস[৬] নামে অভিহিত করা হয়েছে। দাসদের মধ্যে প্রায় সবাই আর্যদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। যারা বিদ্রোহী ছিল তাদের দস্যু নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রয়েছে, শূদ্র ছিল প্রেষ্য; অর্থাৎ শূদ্রকে যে কোনো জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা যেত, হত্যা করা যেত। বোঝা যায় এই ব্রাহ্মণযুগে শূদ্র ছিল অতি হেয় একটি জাতি। বর্ণবিভাজন ছাড়াও এ যুগে আরও কয়েকটি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। যেমন—অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মুতিব ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রাহ্মণযুগ থেকেই শূদ্রজাতির মানুষ নিজের কৃতি ও পাণ্ডিত্যের বলে উচ্চবর্ণের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। যেমন, ঋক্‌বেদের একটি সূক্তের প্রবক্তা ছিলেন কবষ নামে এক ঋষি। এই কবষ প্রথম জীবনে ছিলেন দাসীর গর্ভজাত জারজ সন্তান। সমাজে এক ঘৃণ্য অবস্থানে তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা। অথচ এই কবষ ঋষি নিজের পাণ্ডিত্য ও অনুশীলন দিয়ে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। ঋক্‌বেদের ১০.৩০ সূক্তটি নাকি তাঁর মনেই প্রথম উদিত হয়েছিল।

এমন উদাহরণ বেদের পরবর্তী যুগে আরও চোখে পড়ে। মহীদাস ছিলেন শূদ্র। কিন্তু জ্ঞানের সাধনায় মগ্ন হয়ে তিনিই লিখলেন 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'[৭]। মহীদাস ছিলেন বৈদিক সূক্তের দ্রষ্টাও। যাঁরা 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থটি পড়বেন তাঁরা দেখবেন, ক্ষত্রিয় রাজা জনক তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে ব্রাহ্মণের পদে উন্নীত হয়েছেন এবং উচ্চ ব্রাহ্মণ্য সমাজে ঋষি আখ্যা পেয়েছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম-জাবালের গল্প কে না জানেন। সত্যকামের অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন ঋষি গৌতম। সত্যকামকে তিনি নির্দ্বিধায় ব্রাহ্মণ উপাধিতে ভূষিত করেন। ফলে একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে, বৈদিক যুগ থেকে বর্ণবিভাজনকে জন্মগত স্বীকৃতি বলে যতই প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করা হোক না কেন, সে প্রথার বিরুদ্ধ মতও তৈরি হচ্ছে তথাকথিত আর্য সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই। প্রবহমান স্রোতোধারার গতিপথে পাক খেয়েছে ঘূর্ণি।

পরের যুগে অর্থাৎ কল্পসূত্রের যুগে লক্ষ করা গেছে, বেদপাঠে শূদ্রের কোনো অধিকার নেই।[৮] এমন কী শূদ্রদের কোনো আচার-অনুষ্ঠানে বেদমন্ত্র উচ্চারণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ। কোনো শূদ্র ব্যক্তির সামনে বেদমন্ত্র উচ্চারণও ছিল নিষিদ্ধ। এই সময়ে শূদ্রদের সামাজির অবস্থান ছিল অত্যন্ত খারাপ। উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। ধরা যাক একজন শূদ্র ক্রোধবশত কোনো ব্রাহ্মণকে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রের প্রতি দণ্ড নির্দেশ দেওয়া হত যেন তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি কেটে ফেলা হয়। অথচ শূদ্রকে যদি কোনো ব্রাহ্মণ আঘাত করত তবে তার কোনো শাস্তিই হত না। এক শ্রেণির শূদ্রের নাম ছিল চণ্ডাল।[৯] এদের বাস ছিল এলাকা বা গ্রামের বাইরে কোনো নির্জন জায়গায়। কারণ যে গ্রামে চণ্ডালের বাস ছিল সে গ্রামে ব্রাহ্মণের বেদপাঠ ছিল নিষিদ্ধ। কল্পসূত্রের যুগে শূদ্রদের মনে করা হত শ্মশানের মতো অপবিত্র। শূদ্রের হাতে তৈরি খাবার পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল উচ্চবর্ণের কাছে। তবে কোনো ব্রাহ্মণ সন্তান ইচ্ছে করলে অনূঢ়া শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করতে পারতেন, সে অনুমোদন দিয়েছিলেন পারস্কর ও বৌধায়ন। ধর্মসূত্রে দেখা যায়, শূদ্রের সঙ্গে উচ্চবর্ণের বিবাহের ফলে মিশ্রবর্ণের উদ্ভব হয়েছিল। জীবনের গতি এমনটাই।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে শূদ্রদের অবস্থান কিছুটা ওপরের দিকে উঠে এসেছিল বলেই মনে হয়। রামায়ণে শূদ্রদের দেখা যাচ্ছে শ্রমিক ও ঘরের চাকর হিসেবে কাজ করতে।[১০] দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে শূদ্রদের নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। একজন অন্ত্যজ জাতির রমণী সত্ত্বেও রাম অনুগ্রহ করছেন শবরীকে, তাকে বলা হয়েছে সিদ্ধা। আবার দশরথ তিরের আঘাতে যে বালকের প্রাণ নিয়েছিলেন তার পিতাকে মুনি সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ এই মুনি ছিলেন বৈশ্য এবং তার স্ত্রী ছিলেন শূদ্রা রমণী। মিশ্রবর্ণে জন্ম নেওয়া ওই মৃত বালক স্বর্গলোকে প্রবেশাধিকার